মেঘপাখি

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

প্রবেশক ৯

মেঘপাখি ১৩

জলে জ্বলে জোনাকি ৫১

মাঘনিশীথের কোকিল ৮৯

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৭

প্রবেশক

পঞ্চম কি ষষ্ঠ সেমিস্টারের মিডটার্ম চলছে তখন। এক সকালে মাসুম ও আমি ডাকসুতে বসে আছি মারুফের অপেক্ষায়। পাশের টেবিলে কয়েকজন শিক্ষার্থী উচ্চৈঃস্বরে আড্ডা দিচ্ছিলেন। কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল তাঁরা ইংরেজি বিভাগে পড়েন। জন কীটস এর বিখ্যাত The Human Seasons কবিতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে একজন মিনিট দশেকের ভেতর এত সুন্দর 'সামারাইজিং' করলেন যে, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। চারটা ঋতুর সাথে মানুষের জীবনকে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দেখাচ্ছিলেন তিনি। মাথায় এলো, আমিও তো একটা বই লিখেছি, যেখানে গ্রীষ্মের সুর, বৃষ্টির সুর, বসন্তের সুরায় জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছিলাম। শুনেছি, সেইসব গল্প পাঠকদের একেবারে মন্দ লাগেনি। বাকি তিন ঋতু তবে বাদ রেখেছি কেন? তাদের নিয়েও তো গল্প করতে পারি! শীত নিয়ে লেখার চিন্তা বেশ আগে থেকে ছিল। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই ছয় ঋতুকে আলাদা করে চেনা যায় না এখন। শরৎ-হেমন্তকে ঘিরে বিশদ আকারে কিছু লেখার চিন্তা তাই আমি করিনি। অচেনা ছেলেগুলোর আড্ডা আমাকে অনুপ্রাণিত করল: এই ঋতুগুলোও তা হলে ভাবনার উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। ক্যাফেটেরিয়ার টেবিলে বসে সেদিনই আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই বইয়ের বীজ বপন হলো। কিন্তু সেই বীজের অঙ্কুরোদগম হতে দেরি হচ্ছিল।

দুয়ারে এলো বছরের সেরা মাস। পুরো মাস-জুড়ে সবার সাওয়াব অর্জনের দৃশ্য দেখে গেলাম। আব্বু যাকাত দিলেন। চাচ্চুরা যাকাত দিলেন। আমার অনেক বন্ধুও যাকাত দিয়েছে। আল্লাহ আমাকে নিসাব পরিমাণ অর্থ দেননি। একটা ছোটোখাটো মনখারাপের অনুভূতি ভেতরে জায়গা পেল, যাকাত দিতে পারার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত থাকব? দুশ্চিন্তার কালোমেঘ থেকে একটা ঝুমবৃষ্টির দেখা মিলল। বৃষ্টির নাম বিশর আল-হাফি।

বিশর আল-হাফির নাম অনেকে শুনে থাকবেন। বড় মাপের যাহিদ ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের পাঠও দিতেন। তিনি ছাত্রদের বলতেন, 'হাদীসেরও যাকাত আছে। তোমরা যাকাত দাও।' মানে বুঝলেন? একশো টাকায় যেমন আড়াই টাকা যাকাত দিতে হয়, হাদীসের ছাত্রদের উচিত একশোটা হাদীস শিখলে অন্তত দুই-তিনটা হাদীস মানুষের মাঝে বিতরণ করা। এটাই হাদীসের যাকাত। জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনে ওনাদের যে 'কমিটমেন্ট' আর 'ডেডিকেশন', আমরা তার ধারেকাছেও নেই; ফলে তাঁদের এমনতরো উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে অনেক সময় প্রগলভতা মনে হতে পারে।

তাঁর বাতলে দেওয়া উপায়টা বাস্তবায়ন করব কীভাবে? সঙ্গে থাকা মুতাকিফদের সাথে বেশ কিছু হাদীস শেয়ার করা হলো। কিন্তু আমার যাকাত আরেকটু বেশি জমে আছে। কী করা যায়? গল্প বলতে বলতে কিংবা লিখতে লিখতে হাদীসে ঢুকে পড়ার অভ্যাস আছে। গল্পই তা হলে লিখি। তিন ঋতুকে নিয়ে গল্প করার যে ইচ্ছা ছিল, সেটা এই সুযোগে মিটিয়ে ফেলি। আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন। প্রশংসার সবটুকু তাঁর।

এতদিন বই পড়ে যারা আমাকে দুআ দিয়েছেন, এবার বিশর আল-হাফির জন্যে প্রথমে দুআ করবেন।

***

এই বইয়ের লেখাগুলোতে মজলিসি ঢঙ ঠিক রাখার প্রচেষ্টা ছিল। পরিবারে পিচ্চি-পাচ্চাদের সাথে বসে যেমন গল্প করি, অনেকটা তেমন। তবে লেখাগুলো পিচ্চি-পাচ্চাদের উপযোগী নয়, লেখকের সমবয়সী তরুণ অথবা অনুজপ্রতিম প্রাগ্রসর কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে উপাদেয় হতে পারে। দ্বীনপ্রিয় কিশোর-তরুণদের সাথে গল্প করার অভ্যাস লেখাগুলোর মাঝে ছাপ ফেলেছে সম্ভবত। গল্পের আবর্তন নির্দিষ্ট কক্ষপথকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। সূচনাটা আমি করেছি, এরপর ভাবনার বৈতরণী লক্ষ্যহীন যাত্রা করেছে। কল্পনার বাতাস যেদিকে টেনেছে তার পাল, আমিও সেদিকে ধরেছি হাল।

গল্পগুলো একেবারে সমান্তরাল রাখতে চাইনি। নকশাবিহীন কাঁথা আমার পছন্দ নয়। গল্পের কাঁথাও ফুল-ফলের নকশা ছাড়া ভালো দেখায় না। সেই নকশার রূপরেখা আমরা নিয়েছি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। সেলাইয়ের সুঁই-সুতো সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যপাড়ায় ঘুরে। গত কয়েক বছরে লেখকের পঠিত সেরা পঙ্‌ক্তিগুলোর কিয়দাংশ এখানেই পেয়ে যাবেন। গদ্য পড়তে অভ্যস্ত পাঠক লেখার মাঝে কবিতা দেখে অস্বস্তিতে ভোগেন। তবে এই বইয়ে উদ্ধৃত পদ্যগুলো যথেষ্ট ঋজু

ও গদ্যময়, একেবারে খারাপ লাগার মতো নয়। কাব্যানুবাদে সেই ঋজুতা ধরে রাখার চেষ্টা ছিল। নিবিষ্ট পাঠকের জন্যে বইটি হতে পারে তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্য পাঠের প্রাথমিক প্রস্তুতি।

ফিকশনাল বইয়ে অভ্যস্ত পাঠকদের কাছে একটা বিষয় খটকা লাগবে। কাল্পনিক গল্পের বেশিরভাগ অনুষঙ্গকে ঘিরেই অকাল্পনিক সত্তা খুঁজে ফেরার এই কোশেশ কেন? আল্লাহর কথা কিংবা নবিজি ﷺ-এর সীরাত এভাবে প্রাসঙ্গিক করে দেখানো গল্পের ঢঙের সাথে কি যায়? এই প্রশ্ন আসা যৌক্তিক। আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ও তার কাব্যানুবাদ পেশ করতে চাই। জাহিলি আরবের প্রবাদপ্রতিম কবি আনতারা লিখেছেন :

ولقد ذكرتك والرماح نواهل *

منى وبيض الهند تقطر من دمى

فوددت تقبيل السيوف لأنها *

لمعت كبارق ثغرك المتبسم

(রক্তপিপাসু বর্শা যখন ডেকেছে আমার মরণ
ভারতীয় সাদা তরবারি দেহে করেছে রক্তক্ষরণ
যুদ্ধের সেই কঠিন সময়ও তোমাকে করেছি স্মরণ।
উজ্জ্বল সব তরবারিগুলো ঝলকে উঠেছে যত
হাসার সময় চকচক করা তোমার দাঁতের মতো
মনে হলো আজ তরবারিকেই চুমু খাই অবিরত।)

আনতারা কোনো এক যুদ্ধে লড়াইরত ছিলেন। খুন ঝরানো যুদ্ধের বিপদসঙ্কুল সময়ে প্রেমের কথা বলা একেবারে বেমানান। প্রাণঘাতী সমরে আঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে প্রেমিকার কথা মনে হওয়াটাও অসম্ভব। কিন্তু হৃদয় যখন কোনো কিছুতে সম্মোহিত হয়, স্থানের দূরত্ব বা সময়ের বিরতি সেখানে খাদ আনতে পারে না। চকচক করা উজ্জ্বল তরবারি দেখেই আনতারার মনে পড়েছে তার প্রেয়সীর মুক্তোজ্জ্বল দাঁতের কথা। কল্পনা যেহেতু তরবারিতেই প্রেয়সীর মুখ দেখিয়েছে, এখন সেই তরবারি চুম্বনেই আনতারা ভীষণ আকুল।

ভালোবাসার ব্যাকরণটা এমনই। যেখানে যে অবস্থায় থাকুক, ভালোবাসার মানুষ বা বস্তুকে খুঁজে ফেরার তাড়না আর অনুভব করার প্রেরণা কখনও নিষ্ক্রিয় হয় না। প্রকৃতির রূপ-রস নিঙড়িয়ে গল্প যখন করছি, তখন প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধ হচ্ছি বটে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে অনুভব করছি এই সুন্দর প্রকৃতির স্রষ্টাকেই। আমরা যেহেতু তাঁকে ভালোবাসি, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কথা স্মরণে আসা, তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে মনে পড়া একেবারেই স্বাভাবিক। আপনাদের চোখে আপাতদৃষ্ট 'অপ্রাসঙ্গিকতা'র এই হলো কৈফিয়ত।

'বৃষ্টিমুখর রৌদ্রমুখর' বইয়ের মতো এখানেও উত্তম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে গল্পের কথক হিসেবে। এই 'আমি'টা ব্যক্তিলেখক নন, তবে কিছুক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি বা অভিজ্ঞতার ছাপ প্রচ্ছন্ন।

এখানে বিবৃত পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা তিনটি মূল উপাদান থেকে উৎসারিত: প্রথমত আমার শৈশব স্মৃতি ও আপন গ্রামের হারিয়ে যাওয়া নৈসর্গিক চিত্র, দ্বিতীয়ত বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তৃতীয়ত নিজস্ব কল্পনা। পরিবেশ-প্রকৃতি ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন লেখাজোঁকা নিয়ে আমার প্রবল আগ্রহ, সেসবের ভূমিকা আছে এই কল্পনার বিকাশে। যথাস্থানে উৎসগুলোর বিবরণ পাবেন। চাঁদপুরের বন্ধু নিয়ামাত উল্লাহ, যশোরের বন্ধু মহিউদ্দীন, পল্লীভ্রমণের সাথি কথাশিল্পী আরিফুল ইসলাম ও কবি আবূ সালেহ মাসুম—সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

আল্লাহ যেন আমার ছোটো কাজটা গ্রহণ করেন, এটাকে আমার গোনাহমাফের উপলক্ষ বানান—দুআ করবেন। সংশোধনী বা কোনো দৃষ্টিআকর্ষণী থাকলে অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

মেঘপাখির আকাশে আপনাকে স্বাগতম।

الفقير إلى عفو ربه
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
পদ্মা-২০০৫, বিজয় একাত্তর হল, ঢাবি
জানুয়ারি ১৬, ২০২০ ঈসাব্দ।
amnazib.1997@gmail.com

মেঘপাখি

ভোর হয়েছে। উঠোনের সবখানে থোকা থোকা শিউলি। পাপড়িগুলো প্রস্ফুটিত হয়েছিল রাতে, ভোর হতে হতে ঝরে পড়েছে সিজদার সুখ নিয়ে। সবুজ ঘাসের বিছানায় শিউলি ঘুমিয়ে আছে পরম নির্ভরতায়। দুধসাদা পাপড়ির ওপর হীরের কুচির মতো চকচক করছে কয়েক ফোঁটা শিশির। সকালের সোনারোদ শিউলির বৃন্তে জাফরানি রংটাকে করেছে আরও মোহময়। রোদের সাথে শিউলির নিবিড় আলাপন ভেঙে গেল মক্তবফেরত শিশুদের হাতে। শিশিরভেজা ঘাসে বসে মালা গাঁথছে তারা। দূর থেকে দেখি আর নিজের শৈশবটা বিম্বিত হতে দেখি ওদের চোখেমুখে। দিঘির মাঝখানে কচুরি ফুলেরা জড়ো হয়ে একটা দ্বীপ বানিয়েছে যেন। কচুরিপানাকে যতটা অপছন্দ করি, ততটাই পছন্দ করি কচুরিপানার ফুল। নদীতীরে কাশফুল ঘন হতে শুরু করেছে। বাতাসের দোলায় কাশফুল দোলে। কাশফুলের দোলায় আমার হৃদয় দোলে।

সন্ধ্যা হলেই ছাতিমগাছের নিচে যেতে খেলার সাথিরা ভয় পেত। কে যেন তাদের বলেছিল, এই গাছে ভূত থাকে। ওই দিকে দিনরাত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবক দেওয়া সাদা চামড়ার লোকেরাও একে নাম দিয়েছে 'ডেভিল ট্রি'। অথচ সন্ধ্যা হলেই কী দারুণ ঘ্রাণ ছড়াতে থাকে ছাতিম ফুল! একটু রাত হলে ঘ্রাণ হয়ে ওঠে আরও মাদকতাময়। ছাতিমের ঘন পত্রপল্লব-জুড়ে নৈসর্গিক শিল্প সৌন্দর্যের তশতরি সাজিয়ে বসে, যখন আলো-আঁধিয়ায় এই ফুলে সাদার ওপর সবুজ রং খেলা করে। নবিজি ﷺ-এর প্রিয় দুটি রং এই ফুলটাতে মিলেমিশে সৌরভ ছড়ায়, ছাতিম ফুলকে তাই আমি ভালোবাসি।

ঘাসের ফরাশে ঘনীভূত শিউলি, দিঘির বুকে ফোটা কচুরিফুল, নদীর কোলে দোল খাওয়া কাশফুল আর রাতের শিয়রে জেগে থাকা ছাতিমের ঘ্রাণ জানিয়ে দেয়—শরৎ এসেছে।

শরতের রূপবিভায় সবচেয়ে সুন্দর অনুষঙ্গটা শরতের ঝকঝকে নীলাকাশ। ভাদ্র-আশ্বিনের সতেজ প্রকৃতি আকাশকে যতটা স্বচ্ছদর্পণে দেখে, অন্য ঋতুতে একটানা এত সময় সে অবকাশ মেলে না। পুরো বর্ষা-জুড়ে আকাশ থাকে কালো মেঘের দখলে। সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশের নীল দেখা ভার। বর্ষা শেষ হতে-না-হতেই শরতের আকাশটা হয়ে ওঠে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ঠিক যেন ফ্রেশরুমের আয়না। গোসলের সময় আয়নার গায়ে বাষ্প জমে, কিছুই দেখা যায় না। গোসল সারার পর ধীরে ধীরে সেই বাষ্প সরে যায়, আয়নাটা পরিষ্কার দেখাতে শুরু করে। বর্ষায় পুরো প্রকৃতি সারা দিনমান গোসল করে, সে জন্যেই কি আকাশ সব সময় অস্বচ্ছ থাকে?

রাতের বেলা আকাশটা আরও বেশি নান্দনিক হয়ে ওঠে। দূর থেকে তারাগুলোকে দেখে মনে হয়, উঠোনের শিউলিগুলো কেউ আকাশের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাতভর তারা আর শিউলিতে গল্প হয়। তাদের গল্পের মাঝে আমরাও বসাতাম গল্পের আসর। ঝিকিমিকি তারার ভিড়ে চাঁদটাকে মনে হয় কোনো সভার মধ্যমণি। শৈশবে ক্যাসেট প্লেয়ারে সমবেত নাত শুনতাম : 'লক্ষ তারার মাঝে চাঁদটি যেমন, সব নবিদের মাঝে নবিজি তেমন।' সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে আমাদের নবিজি ﷺ অন্য নবিদের মাঝে চাঁদের মতো, তেমনি সৌন্দর্যের দিক থেকেও তিনি ছিলেন চাঁদের সাথে তুলনীয়। সাহাবি জাবির ইবনু সামুরা ﷺ বলছেন, 'আমি পূর্ণিমার রাতে একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার নবিজি ﷺ-এর দিকে। আমার মনে হলো, চাঁদের চেয়ে নবিজিই বেশি সুন্দর।'[১] আহা, যদি একবার দেখতাম সেই চাঁদমুখ!

কী সৌভাগ্যবান ছিলেন তাঁরা! নবিজি ﷺ-এর সাথে বসে, নবিজি ﷺ-এর পাশে থেকে পূর্ণিমারাত কাটত তাদের। আমরা পৃথিবীতে সেই সৌভাগ্য পাইনি। আল্লাহ, আখিরাতে সেই সৌভাগ্য থেকে আমাদের তুমি বঞ্চিত কোরো না!

এমনই এক পূর্ণিমারাতে নবিজি ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবিদের বলছেন : 'তোমরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখবে। এই-যে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণচাঁদটাকে যেমন স্পষ্ট দেখছ, তেমনই স্পষ্টভাবে।'[২] জান্নাতবাসীদের জন্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার—তারা আল্লাহকে দেখবে। আল্লাহ, সেই পুরস্কারের উপযুক্ত না হবার আগে পৃথিবী থেকে আমাদের ডেকে নিয়ো না।

এরকম 'চান্নিপসর' রাতে আমরা যখন কোথাও হেঁটে যেতাম, মনে হতো চাঁদটাও আমার সাথে হেঁটে যাচ্ছে। পুকুরের পাড় দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হতো, চাঁদটা উবু হয়ে পুকুরজলে আয়না দেখছে। ঘাটে কেউ ওযু করতে বসলে পুকুরে ঢেউ তৈরি হতো। সেই ঢেউয়ের সাথে চাঁদের প্রতিবিম্ব অদ্ভুত সুন্দর নৃত্য করত। নগরজীবনে যে মানুষেরা

শিল্পের পেছনে ছোটে, নান্দনিকতার উৎস খুঁজে হয়রান হয়, তারা কি কখনও একাদশী রাতে পুকুরের ঢেউয়ে দুলতে থাকা চাঁদটাকে দেখেছে?

এই তারা ঝলমলে রাতের দিকে তাকিয়ে আল্লামা ইকবাল লিখেছিলেন : 'সিতারো সে আগে জাহাঁ আওর ভি হ্যায়..' (তারকার ওপারেও আরও জগৎ আছে!) মানে কী? তারকার আলো দেখে ভেবো না, সৌন্দর্যের শেষ এখানেই। মনে করো না, আল্লাহর অপার সৃষ্টির সীমা এখানেই থেমে গেছে। আরও বড় জগৎ পড়ে আছে তোমার অগোচরে। ঝলমলে তারা আর ঝকঝকে চাঁদ দেখে তাদের প্রেমে পড়ে যেয়ো না, তাদের অতিক্রম করে তোমার অনুভূতি পৌঁছে যাক অদেখা জগতের পারে।

একই কবিতায় ইকবাল বলছেন : "তু শাহিঁ হ্যায় পারাওয়াজ হ্যায় তেরা কাম/তেরে সামনে আসমাঁ অওর ভি হ্যায়।" অনুবাদ যদি করতে চাই :

"ছোটোখাটো কোনো পাখি নও, তুমি আকাশের শাহবাজ
যত উঁচু আর যত দূরে পারো, উড়াই তোমার কাজ
খোলাচোখে দেখা কাছের আকাশ নয় তো তোমার রাজ
আকাশের পরে আরও যে আকাশ ডাকছে তোমাকে আজ!"

সত্যিই তো! একজন মুসলিম ছোটো স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। তাওয়াক্কুল এর প্রণোদনা, প্রত্যয়ের প্রবর্তনা আর অসীম সাহসের উদ্দীপনা তাকে পরিণত করে স্বপ্নবাজ কর্মনায়কে। তার হৃদয়ের যাত্রাপথ এই ছোটো পৃথিবীতে শেষ হয় না, এই পথ একেবেঁকে পৌঁছে যেতে চায় সপ্ত আসমানের মঞ্জিল। ছোটো কোনো ডালে বাসা বেঁধে জীবন পার করে দেওয়ার জন্য জন্ম নেয়নি আকাশের শাহবাজ, সীমিত দিগন্তে ডানা ঝাপটানোর জন্যও আসেনি সে; তার জন্মই হয়েছে অদেখা দিগন্ত জয় করার জন্য, আত্মপ্রত্যয়ী পাখায় ভর করে দৃষ্টিসীমার ওপারে ওড়ে যাবার জন্য। মহাজগতের মহাসঙ্গীত শোনার এই নেশা শোণিতে বয়ে চলে বলেই একজন মুসলিম ক্ষয়িষ্ণু-সুরের সুরায় বুঁদ হয়ে থাকে না। তার আবেগ-অনুভূতি বৈষয়িক চাকচিক্যের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে না থেকে স্বর্ণঈগলের ডানা নিয়ে ওড়ে যায় ফিরদাউসের স্বর্ণদ্বার পর্যন্ত। এই অপার্থিব স্বপ্নের কথাই ইকবাল বলতেন।

লক্ষ্য উঁচুতে রাখার এই প্রেরণা, স্বপ্নকে বড় করার এই প্রেষণা সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছ থেকে পাই সবচেয়ে বেশি। প্রিয় উম্মতকে তিনি শেখাচ্ছেন কীভাবে বড় স্বপ্ন দেখতে হয় :

فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن.

> "তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসই চাইবে। এটা অন্য জান্নাতগুলোর মধ্যবর্তী এবং এটা সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত জান্নাত। আমি এর ওপরে আল্লাহর আরশ দেখেছি।"[৩]

আল্লাহর সৃষ্ট জান্নাতগুলোর মধ্যে ফিরদাউস সবচেয়ে সুরম্য ও মনোহর। এটার অবস্থানও বাকি জান্নাতগুলোর ঊর্ধ্বে। আরশের সবচেয়ে কাছে ফিরদাউসের অবস্থান। নবিজি ﷺ যেন-বা বলছেন, জান্নাতের স্বপ্নচারী মানুষেরা, বড় স্বপ্ন দেখো! জান্নাতেই যখন যেতে চাও, সেরা জান্নাতটাই আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নাও।

হাদীসপাঠের অনুভূতিটাই ছন্দে বাঁধার চেষ্টা করেছিলাম একদা :

বুকের খাতায় খুব যতনে
একটা স্বপন আঁকি
ফিরদাউসের ফুল বাগানে
আমি হব পাখি।

স্বপ্ন যত বড় হয়, স্বপ্নপূরণের দায়টাও তত বড় হয়। এ কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি আমাদের রাসূল ﷺ। আরেক হাদীসে বলে দিচ্ছেন : حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات "অপ্রিয় কষ্টকর কাজ দিয়ে জান্নাত বেষ্টিত, আর জাহান্নাম বেষ্টিত লোভনীয় প্রবৃত্তি দিয়ে।"[৪] এই হাদীস কী বলতে চায়? বলতে চায়, তোমার স্বপ্নের মঞ্জিল অনেক দূরে। যদি অলস ও আরামপ্রিয় হও, অষ্টপ্রহর ভোগে মত্ত থাকো, মঞ্জিলে পৌঁছার আগেই বেলা ফুরিয়ে যাবে। কামনার মিষ্টি স্রোতস্বিনীতে ভাসিয়ে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে কোরো না, এই নদী শেষতক আগুনের সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

পাহাড়ি ঢলে শিকড়চ্যুত হয়ে গাছের যে গুঁড়িটা নদীর সুশান্ত প্রবাহে নিজেকে সঁপে দিয়ে আনমনে ভেসে যাচ্ছে, সে হয়তো জানে না, আরও কিছুদূর গিয়ে তাকে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পড়তে হবে, যেখানে উন্মাতাল ঊর্মি ও ঘূর্ণি আছড়াবে তাকে। শিকড়চ্যুত ভাসমান গুঁড়িটার সাথে আমার মিল আছে। আপনার?

শরতের নদী শরতের আকাশের মতোই উপভোগ্য। গ্রীষ্মের মতো ঝড়ের শঙ্কা নেই, বর্ষার মতো আকস্মিক ঢলের ভয় নেই, হেমন্ত ও শীতের মতো নিরস-বিবস শুষ্কতার দেখাও নেই। শরতের কোনো এক বিকেলে নদীর মধ্যপন্থী স্রোতের প্রবাহ

আর জলহারা মেঘের দখলে থাকা স্বচ্ছ আকাশ নদীভ্রমণের জন্য একেবারে জুতসই। খেয়াঘাটের মাঝিকে বলে রেখেছি, আজ বিকেলে নদী ঘুরে দেখব। কতদিন হয়ে গেল, পালতোলা নৌকায় চড়ি না! পানকৌড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে দুরন্ত বালকের সাঁতার, কাশবনে লুকোচুরি খেলায় মত্ত উচ্ছল শিশুদের কোলাহল দেখতে চাই শান্ত নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে। মাঝি এসে ভিড়েছে আমাদের ঘাটে। আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে পড়লাম। একজন আনকোরা প্রকৃতিপ্রেমীকে পেয়ে শরতের নদী খুশিতে মাতোয়ারা, ঢেউভাঙা গান হয়তো সেই খুশিরই বহিঃপ্রকাশ। গলুইয়ে বসে বৈঠা চালাতে থাকা মাঝি কিছুক্ষণ পরপর আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এই পল্লীতে এর আগে আমাকে হয়তো দেখেনি কখনও। পুরোদস্তর কেতাদুরস্ত শহুরে হয়ে গিয়েছি তো, ফুল-পাখি আর নদীর সাথে ভাব জমানোর সুযোগ আর মিলে না। কালেভদ্রে যখন আসি, চুপচাপ সবুজের সাথেই অবুঝ গল্প পাতি। অচেনা মনে হবার পেছনে এও একটা কারণ। হাত বাড়িয়ে নদীর ঠান্ডা জল ছুঁতে চাই। চলন্ত নৌকা থেকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হাত একটা রেখা তৈরি করতে চায়, অঙ্কন ফুটে ওঠার আগেই রেখাটা মুছে যায়। ধ্রুপদী উর্দুকবিতার প্রাণপুরুষ মীর তকী মীর-এর ব্যথিত হৃদয়টা মনে পড়ে :

"নকশ নেহি পানি মে উভরতা য়ে তো কোয়ি আচমভা হ্যায়
সুরত খুব উসকি হ্যায় ফিরতি আকসর চশম তর হ্যায় আব"[৫]

"শুনেছি, পানিতে নকশা ফোটে না, কিন্তু অবাক কাণ্ড, এ কী!
জলভেজা এই দুচোখে আমার তার ছবি কেন ভাসতে দেখি?"

কবিরা এই নদীকে তুলনা করেন নারীর সাথে। কবি আল মাহমুদ এর প্রিয়তমা স্ত্রী নদীতে নেমেছেন, আল মাহমুদ লিখলেন : 'নদীর ভিতরে নদী'। নদী ও নারীর মিলটা ঠিক কোথায়, রবীন্দ্রনাথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। পর্যবেক্ষণটাও দারুণ : '(উভয়ের) একটা বেশ সহজ গতি-ছন্দ-তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্প অল্প শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না।'[৬] মিল খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন কবি জসীমউদ্দীনও। তাঁর উপলব্ধি : 'প্রেমের তটিনী বড় বাঁকা সখি, বাঁকা এর পথ-ঘাট/এ দেশেতে সখি, জলের ডিঙা ফেরে ডাঙ্গার বাঁট।'[৭] আবু জাফর শামসুদ্দীন এর চিত্রকল্প আরেকটু সহজ, কিন্তু মজবুত : 'এখানে রমণীগুলো নদীর মতো/ নদীও নারীর মতো কথা কয়।' রমণী নদীর মতো কীভাবে হয়? তার একটা উত্তর না হয় রবীন্দ্রনাথ বা জসীম এর কাছে পেলাম। কিন্তু নদী কী কথা কয়? নারীর মতো কথাটা ঠিক কেমন? এই উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে আরেক নারীকে। তিনি

কবি নাযিক মালাইকা। আধুনিক আরবি কবিতায় নানা বাঁক পরিবর্তনের ধারায় নাযিক বিশেষভাবে স্মরণীয়। আরব দুনিয়ায় মুক্তছন্দকে জনপ্রিয় করার সিংহভাগ কৃতিত্ব তাঁরই। ফোরাতের তীরে জন্ম তাঁর। চিন্তা ও কল্পনার প্রবাহত ফোরাতের মতোই। নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে মনে পড়ে তাঁর জাদুকরী কবিতার ক'টা লাইন :

ماذا يقول النهر؟
دعى غلاف السرّ كثّا عميق
لو كشف الزّنبق ألغازه
لم يبق معنى لشذاه الرقيق

(কুলুকুলু রবে ঢেউ তুলে তবে কী বলতে চায় নদী?
রহস্যের ওই গল্প না হয় না বলাই যাক থেকে
পদ্মফুলের রহস্য সব জানা হয়ে যায় যদি
অর্থ থাকে না মিহিন ঘ্রাণের, মোহন লাগে না একে।)

সত্যিই তো! কিছু জিনিস রহস্যাবৃত থেকে যাওয়াই সুন্দর, কিছু বিষয় অজানা থেকে যাবার মধ্যেই আনন্দ, কিছু ভালোবাসা দূরত্বেই প্রবল শক্তিশালী। যে নাশিদ আজ খুব ভালো লেগেছে, কয়েকদিন অনবরত শোনার পর সেটাতে বিতৃষ্ণা পেয়ে বসে। অথচ জারুল গাছে ভাটশালিকের গান শুনি আজ কত বছর ধরে, একবারও কিন্তু বিরক্তি আসেনি। কী অদ্ভুত তন্ময়তার সংযোগে শ্যামা পাখির ডাক শুনতে কান পেতে রাখি! ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দ আজও কত আগ্রহ নিয়ে শুনি! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই পাখিদের গানের ভাষা যদি বুঝতাম, ঝিঁঝিঁদের ডাকে লুকায়িত অর্থ যদি উন্মোচিত হয়ে যেত আমার সামনে, হয়তো সেই প্রিয় গানটার মতোই একটা সময় বিতৃষ্ণ হতাম তাদের প্রতি। এরা রহস্যাবৃত থেকেই সুন্দর, অজানা রয়ে গেছে বলেই এরা মনোহর। নাযিক মালাইকার মতো আমিও তাই নদীর ভাষা বুঝতে চাই না। একবার বুঝে ফেললে বারবার বোঝাপড়ার আনন্দ কোথায় আর পাব?

ফোরাতের মতো বেহেশতী নদী নাযিক মালাইকা কাছ থেকে দেখেছেন। 'বেহেশতী নদী' কথাটা আমার নয়, নবিজি ﷺ এই নদীকে এমনই বিশেষণে বিশেষায়িত করেছিলেন।[৮] বেহেশতের নদীগুলো যে নজরকাড়া সৌন্দর্য, নৈসর্গিক প্রাচুর্য আর অব্যাখ্যেয় নান্দনিকতায় ভরপুর, ফোরাত নদীতে তার কিছুটা প্রকাশ পায়, এজন্যে

নবিজি ﷺ এমন প্রশংসা করেছেন। এমন নদীর হাওয়ায় নাযিক তাঁর মন-প্রাণ জুড়িয়েছেন, তবু তাকে রহস্যাবৃত রেখেই আনন্দ খুঁজেছেন।

নাযিকের বিপরীত অনুভূতি খুঁজে পাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কাছে। আমি তাকে আদর করে 'ইংরেজির জীবনানন্দ' বলে ডাকি। ইয়েরো নদী ছিল তাঁর খুব প্রিয়। দজলা-ফোরাতের মতো অতটা সুন্দর না হলেও ইয়েরো তার নিজের মতো চিত্তাকর্ষক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই নদীর কথা শুনেছেন, নদীর রূপবিভা নিয়ে মানুষের উচ্ছ্বাস দেখেছেন, নদীর অপরূপা সৌন্দর্যের বর্ণনা পড়েছেন, লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা Yarrow Unvisited। এই কবিতায় তিনি নদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, নদীর প্রেমে কাতর। একদিন সত্যি সত্যি ইয়েরো নদী দেখার স্বপ্ন পূরণ হলো। এতদিন শুনে আসা বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দেখলেন খুঁটে খুঁটে। হায়, তার কল্পনার সাথে কত অমিল! ইয়েরো তাকে মুগ্ধ করতে পারল না। আরেকটা কবিতা লিখলেন : Yarrow Visited। হতাশার কথা ঝরে পড়ল তাতে। উত্তুঙ্গ প্রেম এখানে হয়ে এলো ক্রমহ্রাসমান। নাযিক নদীর রহস্যকে ধরতে পেরেও অধরা রেখেছিলেন বলে হয়তো নদীপ্রেম পূর্ণমাত্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর আশাভঙ্গের কারণ কি তা হলে নদীর সৌন্দর্য ধরতে চাওয়ার মধ্যেই নিহিত? হতেও পারে। হয়তো সেদিন তিনি বুঝেছিলেন, কিছু ভালোবাসা দূরত্বেই সুন্দর। প্রাচীন আরবের এক কবি তো বহু আগে উপলব্ধি করেছিলেন :

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا

(তোমাদের ছেড়ে দূরে যেতে চাই। কারণ বলতে পারো?
দূরে গেলেই তো তোমরা আমার কাছাকাছি হবে আরও!)

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কল্পনার সাথে নদীর মিল না পেয়ে হতাশ হলেও এই বইয়ের লেখক কবিতার সাথে নদীর ষোলো আনা মিল পেয়েছেন সৌভাগ্যক্রমে। ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'ছোট নদী' পড়েননি, পাঠকদের মধ্যে এমন কেউ সম্ভবত নেই। আহা, কী জীবন্ত ছবি এঁকেছেন তিনি!

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি

চিকচিক করে বালি, কোথা নেই কাদা
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।”

এই কবিতার প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি শব্দ, বরং প্রতিটি অক্ষর হুবহু মিলিয়ে দেখতে চাইলে ডলু নদীর কাছে আসা চাই। লেখক ছোটোবেলায় দাদির সাথে দাদির বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন। নদীর অন্য অংশের কথা জানি না, পুটিবিলার ওই দিকটাতে ডলু নদীর অগভীর অংশ হুবহু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আঁকা। শরতের শেষদিকে এই নদীতে হাঁটুজলই থাকে। রাখাল ছেলেরা সারি সারি গরু পার করে। বর্ষায় ফুঁসে ওঠা নদী শরৎ আর হেমন্তে কেমন যেন নিশ্চল হয়ে থাকে। শীতের সময় পানি আরও কমে যায়। পানির ক্ষীণ প্রবাহ একেবারে নিঃশব্দ। মৃতপ্রায় নদীটাকে দেখে মনে হয়, নিশ্চয় এমনই কোনো নদীর পাড়ে বসে মিখাইল নুআইমা লিখেছিলেন ‘আন-নাহর আল-মুতাজাম্মিদ’ কবিতাটা। আশ্চর্য সুন্দর এক কবিতা। মিখাইলের অধিকাংশ কবিতার মতো ঋজু, স্বাদু ও সাবলীল।

স্রোত হারিয়ে যাওয়া এক শুকনো নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে মিখাইল বলছেন : এই নদীটা কদিন আগেই কলকল ছলছল রব তুলে ছুটে যেত, আজকে সে অর্ধমৃত, তার চলার কোনো ছন্দ নেই, দু কূল ভাসিয়ে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় নেই। নদীর দুই তীরে ফুলে-ফলে সুশোভিত গাছ-গাছালির সারি ছিল, নদীর স্রোতে মরে যাবার পর সেই বাগানও হয়ে পড়েছে নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ। পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত নদীর গায়ে এ কোন কবরের স্তব্ধতা আজ গ্রাস করেছে? বিষণ্ণ মন নিয়ে এ নদীর কাছে এলে জলতরঙ্গের সুরে মন ভালো হয়ে যেত। কালের আবর্তনে সেই নদীটার কাছে আজ সহাস্য-বদনে এসে রুগ্‌ণ অবস্থা দেখে মন খারাপের হাওয়া গায়ে মেখে বাড়ি ফিরতে হয়। এই নদী একদিন কান্না মুছে দিত, হাসির ঝিলিক এনে দিত চোখেমুখে। সেই নদীর কাছে এলে আমার এখন কান্না পায়। কিন্তু এই শুকনো মওসুম খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসবে, শীঘ্রই নদীর কাছে বসন্ত ধরা দেবে। মৃদুমন্দ বাতাসের ছোঁয়ায় নদীর বুকে আবারও ঢেউয়ের নাচন লাগবে, রাত্রিবেলা অযুত তারকা নদীর পানিতে সাঁতরাবে আবারও। পূর্ণিমার চাঁদ নদীর বুকে ঢেলে দেবে রুপালি আলোর ফোয়ারা। দুই ধারে গাছ-গাছালি, গাছের শাখায় পাক-পাখালি, সবই ফিরে আসবে। ঝরে যাওয়া পাতা আবার ফিরে আসবে বাবলা গাছে। সেই গাছে বসে গান গাইবে হরেক পাখি। নদী ভুলে যাবে রিক্ততার দুঃসহ-স্মৃতি, নতুন ছন্দে বাঁধবে এগিয়ে যাবার সুর, জরাগ্রস্ততা কাটিয়ে ফিরিয়ে আনবে চিরচেনা জৌলুস।

এই রুগ্ন নদীর দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়, তার হৃদয়ের সাথে নদীর কত সখ্য!

নদীকে লক্ষ্য করে তিনি করুণ সুরে বলছেন, আমার একটা হৃদয় ছিল। সারাক্ষণ ফুল্ল-ফুলেল ও হাস্যোদ্বেল থাকত। তোমার গতিময় স্রোতের মতোই বাঁধনহারা ছিল সে। কত রং-বেরঙের আশা আর স্বপ্ন ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ত। আজকে সেই হৃদয় রিক্ততায় পূর্ণ, তোমার শুকনো চেহারার মতোই জড়তায় আচ্ছন্ন। রাত আর দিন এখানে একই, সুখ আর দুঃখও এই হৃদয়ে একঘেঁয়ে। বসন্ত আর শীত আলাদাভাবে কোনো ছাপ ফেলে না এই অনুভূতিশূন্য অন্তরে। মানুষের হাসি তাকে টানে না, মানুষের কান্নাও তাকে টলায় না। তোমার স্রোত যেমন সামনের দিকে এগোতে চায় না, আমার হৃদয়ও কারও কাছাকাছি আসতে চায় না। তোমার এই ভগ্নদশার মতোই আমি আজ মানুষের কাছে নিছক হেঁয়ালিপূর্ণ এক ধাঁধা।

মৃতপ্রায় নদীর সাথে তার এত এত মিল! পার্থক্য শুধু একটা। সেই পার্থক্যের কথা বলেই কবিতার ইতি টেনেছেন তিনি :

يا نـهرُ ! ذا قلبي أراه كما أراكَ مكبَّـلا

والفرقُ أنَّك سوفَ تنشطُ من عقالِكَ ، وهو لا

(তোমাকে দেখেছি নিশ্চলতায় বন্দি হয়েছ যেমন
আমার হৃদয়ও জীর্ণতা আর জরায় বন্দি তেমন
তফাত : তুমি তো উচ্ছল আর মুক্ত আবার হবে
আমার হৃদয় বাকিটা জীবন জরাবন্দিই রবে।)

নদীর হারিয়ে যাওয়া স্রোত আবার ফিরে আসবে, কবির হারানো দিন আর ফিরে আসবে না। বর্ষা এলেই নদী দু-কূল ছাপিয়ে প্রাণবন্ত হবে, কবির প্রাণ সেই আগের মতোই রিক্ত হয়ে থাকবে। নদী বার্ধক্যের জীর্ণতায় আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন পর আবারও টইটুম্বুর যৌবন পেয়ে যায়। অথচ মানুষের জীবনে যে তারুণ্য একবার হারিয়ে যায়, তার দেখা আর কখনও মেলে না। নদীর দিকে তাকিয়ে সেই আক্ষেপই ঝরেছে মিখাইল নুআইমার বুকে ও মুখে।

এই সত্যটাকে উপলব্ধি করেছিলেন আল্লামা ইকবালও। তবে তাঁর উপলব্ধি শুধু আক্ষেপে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেখান থেকে উঠে আসার ও উঠিয়ে আনার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রচ্ছন্ন থাকে উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশে। ইকবাল বলতে চান, পৃথিবীতে যাপিত এই জীবন তো শেষমেশ মৃত্যুর কাছে সমর্পিত। কোনো রঙিন স্বপ্নই

পূর্ণতাকে ছোঁয়ার সুযোগ পায় না এখানে। চূড়ায় পৌঁছার আগেই ভূপাতিত হতে হয় স্বপ্নচারীকে। সামান্য ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণা পেলেই থমকে যেতে চায় জীবনের স্বাভাবিক গতি। এই অনিশ্চিত, ভঙ্গুর আর জরাগ্রস্ত জীবন কীভাবে মানুষের চূড়ান্ত চাওয়া হয়? মানুষের উচিত এমন জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানানো, যেখানে স্বপ্নের মৃত্যু নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণার ছোবল নেই, ভাঙা-গড়ার অনিশ্চয়তা কিংবা হারিয়ে ফেলার ভয় নেই। যেখানে মিখাইল নুআইমার মতো নিষ্ফল আক্ষেপের আর্তি নেই, আছে অনিঃশেষ তারুণ্য আর প্রাণবন্ত নিশ্চিত জীবনের আয়োজন। কী দরদ ঢেলে লিখেছিলেন ইকবাল :

এই যে পৃথিবী, রূপ ও রঙের এই এত কোলাহল
মৃত্যুর হাতে পড়ে এ জগৎ হয়ে যায় নিশ্চল
গান গাওয়া আর গান শোনার এ মনোহর মন্দির
একটু ক্ষুধা ও তিয়াসকে ঘিরে জীবনটা অস্থির
সাময়িক কোনো ঠিকানা হিসেবে হৃদয় বাঁধুক বাসা
পথিক, এমন ভঙ্গুর নীড়ে করো না থাকার আশা
(হৃদয় তোমার জিরাক এখানে কিছুক্ষণের জন্য
মনে রাখো, এটা চূড়ান্ত নয়, সেই মঞ্জিল অন্য)
বরং পাহাড় ডিঙিয়ে ছোটো আরও সম্মুখ পানে
অজানা জগৎ ছোঁয়ার আশাই জাগুক তোমার প্রাণে!
পূর্ণতা চাই। অন্তর কেন শূন্যতা-ঘেরা হবে?
(শূন্যতা যেথা থাকবে না মোটে, সেখানেই চলো তবে।)[৯]

কবির সাথে আমরাও একমত। পৃথিবীতে যাপিত এই বালির বাঁধের জীবন আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য নয়। আমরা আদিগন্ত আকাশের বিহঙ্গ, আমরা অনন্ত জীবনের স্বপ্নচারী। সেই অনন্ত জীবনকে কুরআনের ভাষায় আমরা 'আখিরাত' বলি। আখিরাতকে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে উত্তম মনে করি। করবই না বা কেন? যখন আল্লাহ নিজেই আমাদের বলেন : وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ "দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখিরাতের জীবনই তোমার জন্য উৎকৃষ্ট।"[১০] কেন উৎকৃষ্ট, তার একটা ব্যাখ্যা হয়তো ইকবালের কবিতাটাই। আমরা আল্লাহর কথাকে বিশ্বাস করি, আল্লাহর কথায় আস্থা রাখি, আল্লাহর কথাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসকে আরও সংহত করতে চান আল্লামা ইকবাল। ওপরের কবিতাটাও আমাদের বিশ্বাসের পালে ভাবনার হাওয়া লাগিয়েছে।

অনুভবে টের পাই, এই হাওয়ার উৎস পৃথিবীতে নেই। তাই পৃথিবীকেও আমরা স্বপ্নের চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল বানাতে চাই না। আমাদের স্বপ্ন পত্র লিখবে অজর-অবিনাশী ফিরদাউসের ঠিকানায়।

নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে দাদাভাইকে মনে পড়ে। কুরআন থেকে গল্প করতে করতে, ইকবালের কবিতা শোনাতে শোনাতে আমাদের তিনি শেখাতেন—কী করে চূড়ান্ত স্বপ্নের তোরণদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়। নদীতে ভাসমান নৌকার উদাহরণ দিতেন তিনি। বলতেন, এই জীবন একটা নৌকার মতোই। নৌকা যেমন এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ছুটে যায়, আমরাও দুনিয়ার ঘাট থেকে আখিরাতের ঘাটের দিকে এগিয়ে চলছি। দুনিয়ার জীবন থেকে যারা একেবারে বিরাগী, তারা সেই নৌকার মতো, যেটা ঝড়-তুফানের ভয়ে ডাঙায় উঠে রোদ পোহায়। ডাঙায় কিছুদিন নির্ভার থাকে বটে, কিন্তু রোদের তাপে জ্বলে শেষমেশ অব্যবহার্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ে। জলবিহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে এই নৌকার আর কোনো মূল্য নেই। নৌকার জন্মই হয়েছে পানিতে ভাসার জন্য। কাজেই, দুনিয়ার জীবনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে একেবারে বৈরাগী হওয়া যাবে না। জীবনের নদীতে নৌকা ভাসাতেই হবে। জাহেলিয়াতের ঝড় কিংবা ফিতনার উত্তাল তরঙ্গে মাঝে মধ্যে এ নৌকার পাল ছিঁড়ে যাবে, দেরি না করে সেই পাল আবার জোড়া দিতে হবে। ঝড় দেখে ভয় পাওয়া কিংবা নির্বিবাদ থেকে ঝড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা মুমিনের কাজ নয়। ঝড়ের মুখে দৃঢ়তার সাথে হাল ধরার কৌশল, শক্তি ও সাহস রপ্ত করাই তার কাজ।

পানির ওপর নৌকা ভাসে, সত্য। কিন্তু পানির সাথে লেগে থাকে নৌকার পিঠ। যদি নৌকার বুক পানির সাথে আলিঙ্গন করতে চায়, নৌকা নিশ্চিত ডুবে যাবে। দুনিয়ার জীবন নদীর পানির মতোই। আমরা একে যাপন করি, সত্য, তবে তাকে বুকে টেনে নিই না। আমরা জানি, তাকে বুকে জড়ানো মানেই অতলে তলিয়ে যাওয়া, চূড়ান্ত স্বপ্নের ঘাটে নোঙর ফেলা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

তীরের কাছ ঘেঁষে নৌকা চলছিল। কেতকী ফুলের দেখা পেলাম অনেকদিন পর। নারকেলের গাছগুলো কিছুদূর পরপর নিঃসঙ্গ ভাবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো ছোটো কিছু শ্বেতফুল ঝোপে উঁকি দেয়। বেলী, জুঁই, নাকি কুন্দ—দূর থেকে ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না। গোচারণ মাঠে অনেক গরু। কিছুক্ষণ পরপর দুয়েকটা গরুর হাম্বা রব ভেসে আসছে। তীরে বাঁধা কয়েকটা কোসা নৌকা ঢেউয়ের সাথে দুলছে। জেলেদের দীর্ঘ জাল শুকাতে দেওয়া হয়েছে নদীর পাড়ে। কয়েকটা জেলে ছেঁড়া জাল সেলাই করছে বসে বসে। অনেকদিন হয়ে গেছে, নদীতে হঠাৎ উঁকি দেওয়া কোনো শুশুকের

দেখা মিলছে না। আজকেও এখন পর্যন্ত চোখে পড়ল না। তবে আরেকটা জিনিস না চাইতেই দেখা পেয়ে গেলাম। শানদার একটা ঘাটে প্রকাণ্ড এক সওদাগরী নৌকায় পাল বাঁধা হচ্ছে। মাল-সামান ভর্তি করা প্রায় শেষ। সহযোগীদের নৌকায় উঠে পড়তে ডাক দিচ্ছে সারেঙ। নদীতে ছোটো-বড় আরও অনেক নৌকাই ভাসছে। এদের ভিড়ে দ্বিতল নৌকা খুঁজে পাচ্ছি না। না পেলেও কসুর নেই, আপনাদের একটা দ্বিতল নৌকার চিত্র দেখাই হাদীসের পাতা খুলে।

নবিজি ﷺ যেভাবে এঁকেছেন এই নৌযানের চিত্র :

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

> আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমালংঘনকারীর উদাহরণ হলো : একদল লোক লটারি করে একটি নৌযানে উঠল। তাদের কেউ নিচের তলায়, আর কেউ ওপরতলায় জায়গা পেল। নিচের তলার মানুষদের পানির দরকার হলে তারা ওপরতলার লোকদের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করত। (এতে তারা বিরক্তবোধ করলে) তারা বলল, আমাদের এখান দিয়ে আমরা যদি একটি ছিদ্র করে নিই, তা হলে ওপরতলার লোকদের কষ্ট দেওয়া লাগত না। এখন ওপরতলার লোকেরা যদি তাদেরকে এই কাজ করতে ছেড়ে দেয়, সবাই মিলে ধ্বংস হবে। আর যদি তারা এদের বাধা দেয় (অর্থাৎ নৌকার তলা ফুটো করতে না দেয়) তা হলে নিজেরাও বাঁচবে, অন্য সবাইকেও বাঁচাতে পারবে।[১১]

এই এক দ্বিতল নৌকাতেই আমাদের সবার চিত্র আঁকা হয়ে গেছে। আমি পরিবারের কর্তা। অথবা সিনিয়র সদস্যদের একজন। স্বভাবতই আমার অবস্থান অন্য অনেকের ওপরে। পরিবারের কোনো সদস্য কিংবা সন্তানদের কেউ যখন দ্বীনবহির্ভূত কাজ করতে শুরু করবে, তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার। আমি যদি তাকে সংশোধন করতে আগ্রহী না হই, 'যা ইচ্ছে করুক গে' বলে ছেড়ে দিই, তা হলে পুরো পরিবারই ধীরে ধীরে জাহেলিয়াতে ডুববে। আমি আলিম, চিকিৎসক অথবা শিক্ষক। সারা দিনমান জ্ঞানচর্চায় রত, পঠন-পাঠনে নিয়োজিত, গর্হিত কাজে আমার অংশগ্রহণ নেই। আমি সৎ ব্যবসায়ী, আমানতদার চাকুরে, কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবী। লোকে আমাকে অন্য